সভ্যতার আলো

কালিনগর মহাবিদ্যালয়
ইতিহাস বিভাগীয় পত্রিকা
ইতিহাস বিভাগ

সভ্যতার আলো

প্রথম সংস্করণ প্রথম বর্ষ,

সম্পাদক ঃ সুব্রত বিশ্বাস

সহ সম্পাদক ঃ রতন বিশ্বাস, পুলক কুমার দাস

কার্যনির্বাহী কমিটি ঃ সুদীপ্তা বর্মন, অয়নী মণ্ডল, তনুশ্রী সরদার,
শ্রাবনী সরকার, অরূপ ঘোষ

প্রকাশক ঃ ডঃ ঈশানী ঘোষ, ভারপ্রাপ্ত অধ্য(া, কালিনগর মহাবিদ্যালয়

কপিরাইট ঃ @ কালিনগর মহাবিদ্যালয়

প্রচ্ছদ ঃ প্রিন্ট দ্যুতি

বর্ণস্থাপন ও মুদ্রণ ঃ প্রিন্ট-অল, বসিরহাট

তারিখ ঃ ১০ ই জুন, ২০২৩

শুভেচ্ছাবার্তা

আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের কলেজের ইতিহাস বিভাগ, যা আমার নিজের বিভাগ বলে একটু বেশি আত্মতৃপ্তির জায়গাও বটে, প্রথমবার ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা নিয়ে একটি বিভাগীয় পত্রিকা প্রকাশ করতে চলেছে। আমি এই উদ্যোগের জন্য আমার বিভাগের সকল অধ্যাপক ও যারা লিখেছো সেই সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দন জানাই। তোমাদের এই আন্তরিক প্রচেষ্টাকে বিভাগ আগামীদিনে স্মরণে রাখবে। আশাকরি এই পত্রিকা কলেজের বিদ্যায়তনিক সাফল্যের পথে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মেলবন্ধনে এই পত্রিকার আগামীদিনে আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, এই কামনা করি।

সকলে ভালো থেকো

Ishani Ghosh

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

কালিনগর মহাবিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

মানব সভ্যতার সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ ও তার ত্র(মবিবর্তনের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। যদিও সভ্যতার সৃষ্টিতে যেমন শু(থেকেই আলোকিত এবং অন্ধকার উভয় দিক রয়েছে। তেমনই ইতিহাস গবেষণা বা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করনেও আলোকিত এবং অন্ধকার উভয় দিক বর্তমান। তাই ইতিহাস শুধুমাত্র গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নয়, আনুসঙ্গিক বা সমসাময়িক পারিপার্শ্বিক সভ্যতার এবং পরিবেশের অবস্থার পরিপ্রে(তে ও গড়ে ওঠে। ইতিহাসের এইসব লিপিবদ্ধ তথ্য পাঠ এবং সে বিষয়ে অনুসন্ধান বা চর্চা 'মানব সভ্যতার সামগ্রিক ইতিহাস' চর্চার অনুসঙ্গ। সেরূপ একটি ইতিহাস অনুসন্ধানের (ুদ্র প্রয়াস কালিনগর মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের পত্রিকা ''সভ্যতার আলো''।

বিভাগীয় এই পত্রিকাটির মধ্যদিয়ে বিভাগের শি(ার্থীরা মুক্ত(ভাবে তাদের ইতিহাস চিন্তা ও চেতনার প্রকাশ করেছে। সুন্দরবনের প্রান্তিক কয়েকটি দ্বীপের প্রায় প্রথম জেনারেশন শি(ার্থী এরা সবাই। তাদের ইতিহাস চিন্তনের মধ্যে ধরা পড়েছে সুন্দরবন বিষয়ক ইতিহাস, ভারতমাতার চিত্র অঙ্কনের ইতিহাস, অতি সম্প্রতি প্রচলিত জাতীয় নতুন সংসদ ভবন উন্মোচন সংক্র(ান্ত রাজনৈতিক ইতিহাস, আবার ভূগর্ভের জলসংকট সংক্র(ান্ত আশঙ্কা প্রকাশ করে পরিবেশগত ইতিহাসকে তুলে ধরেছে নিজস্ব চিন্তায়। পাশাপাশি অনেকে তাদের পাঠ্য সিলেবাসের অন্তর্গত বিষয়ে নিজেদের চিন্তার প্রকাশ করেছে। যেমন, মারাঠা পেশোয়া বালাজী বি(্বনাথের জীবন ও আদর্শ, বিপ্-বী (ুদিরাম বসুর আত্মত্যাগ, স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজি, স্বদেশী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যান্য বিষয়। প্রথম বি(্বযুদ্ধ ভারতীয় রাজনীতির ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল সে বিষয়টিও শি(ার্থীদের লেখনির মধ্যে উঠে এসেছে। এভাবে শি(ার্থীদের সামগ্রিম প্রয়াসের মাধ্যমে বিভাগীয় পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা সমৃদ্ধ হয়েছে।

পত্রিকাটি সফলভাবে প্রকাশের জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ দেব বিভাগের সকল অধ্যাপক - অধ্যাপিকাদের। বিভাগের শি(ার্থীদের যারা প্রত্য(এবং পরো(ভাবে বিষয়টির সাথে যুক্ত(। সর্বোপরি ধন্যবাদদেব কালিনগর মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্য(া ড. ঈষানী ঘোষ ম্যাডামকে এবং IQAC সেলের কো-অর্ডিনেটর স্যারকে এবং বিভাগীয় পত্রিকা প্রকাশ বিষয়ক কলেজ কমিটির সকল সদস্যকে।

সুব্রত বি(্বাস
সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান
ইতিহাস বিভাগ

সূচীপত্র

* **ভারতমাতা চিত্র অঙ্কনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান**
— তনুশ্রী মাহাতো (Hons., 4th Sem)
* **পর্যটকের দৃষ্টিতে ''স্বপ্নের সুন্দরবন''**— দিশা গায়েন (Hons., 2nd Sem)
* **ভারতের নতুন সংসদ ভবন উন্মোচন ঐতিহ্য ও বিতর্কের সংমিশ্রণ**
— সরনাপ আঢ্য (Hons., 2nd Sem)
* **''প্রকৃত শি(া, শি(ক এবং শি(ার্থী প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ''**
— সুব্রত বি্বাস, বিভাগীয় প্রধান
* **জল সংর(নের ইতিহাস** — হারান গায়েন (Hons., 2nd Sem)
* **বালাজী বি্বনাথ (১৭১৩-২০ খ্রীঃ)** — শ্রাবনী সরকার (4th Sem)
* **স্বদেশি ও বয়কট (১৯০৫-১১)** — রূমা দাস (Hons., 6th Sem)
* **স্বদেশী আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** — রীনা মন্ডল (Hons., 6th Sem)
* **ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজির উত্থান (১৯১৫-২০)**
— অয়নী মন্ডল (Hons., 6th Sem)
* **হোম(ল আন্দোলন (১৯১৬)** — সাগরিকা মন্ডল (4th Sem)
* **রাওলাট সত্যাগ্রহ (১৯১৯)** — অ(প ঘোষ (Hons., 6th Sem)
* **ভারতীয় রাজনীতির ওপর প্রথম বি্বযুদ্ধের প্রভাব (১৯১৪-১৮)**
— দূর্বা গাইন (Hons., 6th Sem)
* **গান্ধীজি ও ডান্ডি অভিযান** — সুদীপ্তা বর্মন (Hons., 6th Sem)
* **বিস্ময় বিপ্লবী (ুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮)** — ক(নাময়ী সরদার (Hons., 4th Sem)
* **সুন্দরতম সুন্দরবন** — মৌসুমী রপ্তান (Hons., 2nd Sem)

ভারতমাতা চিত্র অঙ্কনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান

— তনুশ্রী মাহাতো (Hons., 4th Sem)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১ খ্রিঃ) ছিলেন একজন বিখ্যাত চিত্রকর। ভারতবর্ষের আধুনিক চিত্রশিল্পের জনক হিসাবে তিনি পরিচিত। তিনি সংস্কৃত কলেজে পড়া শেষ করে ক্যালকাটা স্কুল অফ আর্ট-এ ভর্তি হয়ে (১৮৯০ খ্রিঃ) প্যাস্টেল কালার ও তৈল চিত্র অঙ্কন রীতি শেখেন এবং পাশ্চাত্য রীতিতে বিলাতি পোর্ট্রেট আঁকতেন।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের পর তিনি জল রং ব্যবহার করে ছবি আঁকার কৌশল শু(করেন। চিত্রশিল্পী বিশেষত ই বি হ্যাভেলের প্রভাবে ভারতীয় চিত্রশিল্প রীতিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনকালে আধ্যাত্মবাদ ও দেশপ্রেমভিত্তিক স্বদেশী চিত্রশিল্প অঙ্কন শু(করেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতমাতা চিত্রটি অঙ্কন করেন। এই বিখ্যাত ছবিটি আঁকা হয় ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। এই অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় ছবিটিকে ''ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক'' হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ভারতমাতা চিত্র অঙ্কনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি জাপানি 'ওয়াশ' পদ্ধতিতে রঙে প্রলেপ ব্যবহার করে ভারতমাতা চিত্রটি এঁকেছেন এবং এভাবে নব্যবঙ্গ চিত্ররীতির সূচনা করেন। এই চিত্রের মাধ্যমে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয়তাবাদকে মাতৃত্বের ধারনার সঙ্গে যুক্ত(করেন। পরনে ছিল গে(য়া বসন পরিহিতা।

বরাভয়দায়িনী এবং ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মূর্ত প্রতীক ভারতমাতার চার হাতে শোভা পাচ্ছে (দ্রা(র মালা, শুভ্র বস্ত্র, পুথিঁ ও ধানের শিষ এবং পদযুগলের চারপাশে রয়েছে শ্বেতপদ্ম। এগুলি ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

স্বদেশী আন্দোলনে ছবিটি জাতীয়তাবাদের প্রসারে গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলো ভারতের অন্যান্য জাতীয় আন্দোলনে ও ছবিটি ব্যবহার করা হয়েছিল। বিপ-বী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে ভারতমাতা ছিলেন প্রেরনার প্রতিমূর্তি।

পর্যটকের দৃষ্টিতে ''স্বপ্নের সুন্দরবন''

— দিশা গায়েন (Hons., 2nd Sem)

সুন্দরবন হলো পৃথিবীর সবথেকে বড়ো ম্যানগ্রোভ অরণ্য। সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় ১০ হাজার বর্গ কিমি.। এটি সাধারণত ম্যানগ্রোভ অরণ্য হলেও এই বনে থাকা 'সুন্দরী' গাছের জন্যই এই অরণ্যের নাম হয়েছে সুন্দরবন। নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি এই লেখাটা সাজিয়েছি নিজের মতো করে সুন্দরতম সুন্দরবনকে নিয়ে।

সালটা ছিল ২০২১, সময়টা শীতকাল। আমি আমার পরিবারের সাথে সুন্দরবন ট্যুরে গিয়েছিলাম। আমাদের ট্যুরিস্ট নৌকাটি ছেড়েছিল সকাল ৯টা নাগাদ। জীবনে প্রথম সুন্দরবন দেখবো তাই আনন্দটাও ছিল অন্য রকমের। আমাদের নৌকা যখন রায়মঙ্গলের উপর দিয়ে যাচ্ছে তখন একটু দূরত্ব থেকে সুন্দরবন কে দেখতে পাচ্ছি। নদীর দুপাশ দিয়ে সীমাহীন জঙ্গল যার কোনো শেষ চোখে দেখা যাচ্ছে না। এত বিস্তৃত

বনভূমি আমি আগে কোনোদিন দেখিনি। এরপর আমরা চলে গেলাম সজনেখালির অফিসে সেখানে গিয়ে আমাদেরকে প্রথমে Welcome করতে এসেছিল কয়েকটা বাদরের দল। তারপর আমরা গেছিলাম বনের ভিতরে সেখানে পর্যটকদের দেখার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। সেখানে গিয়ে পরিচয় হল সুন্দরী, গোলপাতা, হোগলা, মেহগনি, কেওড়া, ঝামটি, গরান ইত্যাদি গাছের সাথে। সবগাছ গুলো যেন জঙ্গল কে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রেখেছে। সুন্দরবন বিখ্যাত সুন্দরী গাছের জন্যে, আর এই সুন্দরী গাছের বিশেষ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো। ওখানকার মাটি যেহেতু লবনাক্ত(তাই গাছের কিছু শাখা-মূল অভিকর্ষের বিপরীত দিকে ধাবিত হয়ে মাটির উপর উঠে আসে। এই সব মূলের উপরিভাগে অসংখ্য ছিদ্র থাকে। এগুলিকে বলে শ্বাসমূল। আর মাটি যেহেতু লবনাক্ত(তাই ফলের বীজ মাটিতে পড়লে নষ্ট হয়ে যায় তাই সুন্দরবনের গাছ গুলিতে রয়েছে বিশেষ (মতা তারা ফলের মধ্যেই বীজ কে তৈরি করে অঙ্কুরোদগম করে দেয় ফলে বীজ মাটিতে পড়ার সাথে সাথে গাছ বেরিয়ে যায়। সবগাছের সাথে আলাপ শেষ করে আবার আমরা ফিরে গেলাম নৌকাতে। সূর্য ডুবতে যায়। এবার আমাদের গন্তব্য স্থল ছিল পাখিরালয় মার্কেট। সূর্য ডোবার মুহূর্তটা ছিল অসাধারণ, চারিদিকে প্রকৃতি যেন এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ভেসে আসছিল নানা ধরনের পাখির ডাক। নানা ধরনের রংবেরং এর পাখি ফিরছিল তাদের বাসায়। সন্ধ্যে পড়ার সাথে সাথে আমরা চলে গেছিলাম পাখিরালয় বাজারে। সেখানে গিয়ে দেখলাম চারিদিকে কত রং বেরং এর কত বাহারী জিনিস এর দোকান। সেখানকার মানুষের জীবন জীবিকা নির্ভর করে পর্যটকদের উপর। আর তাদের এই ব্যবসা বাণিজ্য ভালো চলে শীতের সময় কারণ এই সময় পর্যটকরা বেশি ভীড় করে সুন্দরবনে। তার পর আমরা গিয়েছিলাম ওখানকার 'লোকনৃত্য' দেখতে। এই নৃত্য ছিল ওখানকার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেখানে মেয়েরা একই রকমের শাড়ি পরে মাথায় ফুল দিয়ে নাচ করছিল। তারা মানুষকে নাচ দেখিয়ে পরিবারে মুখে খাবার তুলে দেয়। পাখিরালয় বাজারে একদম খাঁটি মধু পাওয়া যায়। তারা জীবনের পরোয়া না করে পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্যে বনের ভিতর থেকে মধু সংগ্রহ করে নিয়ে এসে বাজারে বিক্রি(করে। তো এবার আমরা রাত্রে থাকার জন্য ফিরে এসে ছিলাম নৌকাতে। নদীর সাথে এভাবে সময় কাটাবো জীবনে কোনোদিনও ভাবিনি। রাতটা ছিল আমার কাছে খুবই উত্তেজনার কারণ গভীর রাতে চারিদিক থেকে ভেসে আসছিল নানা পশুর ডাক, পেঁচার ডাক আর জলের একটা অদ্ভুত শব্দ বার বার ধাক্কা দিচ্ছিল নৌকাতে।

পরদিন সকালের সূর্যদয়টা আমার মন ছুঁয়ে গেছিল। প্রতিদিন সূর্যদয় দেখলেও সেটা ছিল আলাদা একটা অনুভূতি। তারপর আমরা চলে গেলাম সজনেখালিতে। সেখানে গিয়ে সুন্দরবন আসাটা সার্থক হয়েছিল। কারণ সেখানে গিয়ে আমরা দেখা পেয়েছিলাম সুন্দরবনের জাতীয় পশু 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'। মানে ছোটো বেলা থেকে যে বাঘ মামার গল্প শুনে বড়ো হয়েছি তার। মনে অনেক আনন্দ নিয়ে আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছিলাম। অনেকে দেশ বিদেশ থেকে অনেক টাকা খরচা করে এসেও বাঘের দেখা পায়না। কিন্তু আমাদের ভাগ্যটা অনেক ভালো ছিল।

ভারতের নতুন সংসদ ভবন উন্মোচন ঐতিহ্য ও বিতর্কের সংমিশ্রণ

— সরনাপ আঢ্য (Hons., 2nd Sem)

২০২৩ সালের ২৮ শে মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক উন্মোচন করা ভারতের নতুন সংসদ ভবনটি দিল্লির সেন্ট্রাল তিস্তা কমপে-ক্সের বৃহত্তর পুনর্নবীকরণ প্রকল্পের একটি গু(ত্বপূর্ণ মাইলফলক। একটি জাঁকজমকপূর্ণ ত্রিকোণ ভবন হিসাবে ডিজাইন করা নতুন সংসদ ভবনটি তার দুটি ক(লোকসভা (নিম্নক( ) এবং রাজ্যসভা (উচ্চক( ) জুড়ে ১,২৭২ জন সংসদ সদস্যকে ধারণ করার (মতা রাখে। জাতির বৈচিত্রময় সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্য উদযাপন করে, ভবনের স্থাপত্য বিভিন্ন অঞ্চল এবং সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী বৈশিষ্ট্য এবং শিল্পকর্ম প্রদর্শন করে। লোকসভা চেম্বারটি ভারতের জাতীয় পাখি ময়ূর থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে এবং রাজ্যসভার চেম্বারটি জাতির শ্রদ্ধেয় ফুল পদ্ম দিয়ে সজ্জিত। নতুন সংসদ ভবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্প গ্যালারি রয়েছে। যা সারা ভারত থেকে শিল্প ও কা(শিল্পের বিস্তৃত রং প্রদর্শনের জন্য নিবেদিত একটি সংরি(ত স্থান। গ্যালারিতে বিরল এবং চমৎকার নির্দশনগুলির একটি সংগ্রহ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে উত্তরপ্রদেশের ব্লক প্রিন্ট কারিগরদের ব্যবহৃত একটি কাঠের ব্লক, বারানসীর সারমর্ম প্রদর্শনকারী একটি সিল্ক উপস্থাপনা এবং ১৯৪৭ সালে হিন্দু পুরোহিতদের দ্বারা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহে(কে উপহার দেওয়া সেনগোল নামে একটি ঐতিহাসিকভাবে গু(ত্বপূর্ণ সোনার রাজদন্ড। তবুও নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন বিতর্কমুক্ত(ছিল না। বেশ কয়েকটি বিরোধী দল এই অনুষ্ঠান বয়কট করে দাবি করে যে প্রধানমন্ত্রী মোদী রাষ্ট্রপতির কাছে পিছিয়ে না গিয়ে উদ্বোধনী বা উদ্বোধনের ভূমিকা গ্রহণ করে সাংবিধানিক এবং সংসদীয় পদ্ধতি লঙ্ঘন করেছেন। যদিও হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ ভিডি সাভারকরের জন্মবার্ষিকীতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করার সিদ্ধান্তটি সমালোচনার মুখে পড়েছিল কারণ কেউ কেউ এটিকে বিভাজনমূলক বলে মনে করেছিলেন। ফলস্বরূপ বি(াভ শু(হয়, যার ফলে কুস্তিগির সহ কিছু বি(াভকারীকে আটক করা হয়, যারা সংসদের দিকে মিছিল করার চেষ্টা করেছিল। ভারতের স্বাধীনতার ৭৬ তম বার্ষিকীর সাথে মিল রেখে ২০২৪ সালের মধ্যে এটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। নতুন সংসদ ভবনটি জাতির আকাঙ্খা এবং স্বপ্নের প্রতীক, প্রধানমন্ত্রী মোদী এটিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আইনপ্রণেতা এবং নাগরিকদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক স্থান হিসাবে কল্পনা করেছেন।

''প্রকৃত শি(া, শি(ক এবং শি(ার্থী প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ''

— সুব্রত বি(্বাস, বিভাগীয় প্রধান

প্রত্যেক জাতির উত্থানের মূলে রহিয়াছে — শি(া। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গভীর চিন্তা ও জ্ঞানের আলোকে শি(া বিষয়কে বিশ্লেষণ করেছেন। শি(া কিভাবে কোনপথে বালক বালিকাগণের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানে সহযোগিতা করিতে পারে এবং গব্য ভারত গঠনে কার্যকর হইতে পারে — তা আলোচনা করেছেন। স্বামীজী শি(ার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন — ''Education is th manifestation of the perfection already in man'' (প্রকৃত শি(া হইতেছে তাহাই যাহা মানব প্রকৃতির অজ্ঞান আবরন উন্মোচন করে তাহার পূর্ণতা বিকাশের সহায়ক হয়।) তাঁহার ভাষায় প্রকৃত মানুষ গড়িয়া তুলিবার প্রকৃষ্ট উপাদান শি(া।

ইউরোপের বহু দেশের উন্নত নগর ও সমৃদ্ধ মানব সমাজ পূর্যবে(ন করে স্বামীজী উপলব্ধি করেন শি(াই তাদের সঙ্গে ভারত ভূমের সমাজ সভ্যতার মূল পার্থক্য। স্বামীজী বলেছেন শি(া হচ্ছে মানুষের ভিতরে বিরাজমান পূর্ণতার প্রকাশে যা কিছু অন্তরায়, সেই সকলকে অপসারিত করিতে প্রধান সহায়ক - শি(া। প্রতিটি মানুষ শি(া লাভের মধ্য দিয়েই পূর্ণতার বাধা সরিয়ে ত্র(মশঃ নিজেকে আবিষ্কার করে। মন-কে তাই তিনি জগতের অনন্ত পুস্তকাগার বলেছেন। শি(া মনকে সমৃদ্ধ করে - আমরা বলি তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি হচ্ছে, মানবগুন লাভ করেছো।

উৎকৃষ্ট শি(ালাভের জন্য চাই প্রবল ইচ্ছা শক্তি(। ইচ্ছাশক্তি(ছাড়া যেমন প্রাতঃসূর্যের উজ্জ্বল ছবি মনকে মুগ্ধ করে না, তেমনি ইচ্ছাশক্তি(ছাড়া শি(া অগ্রসর হতে পারে না। ইচ্ছাশক্তি(র যেথায় যত সফল প্রয়োগ। সেথায় তত শি(ার বিকাশ। আবার ইচ্ছাশক্তি(দ্বারা প্রাপ্ত শি(া-ইচ্ছাশক্তি(র বিকাশ এবং প্রয়োগকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে। তখন শি(ার্থীর একটাই কাজ সে পথে নিজেকে পরিচালি করা।

শি(ক শি(ার্থীকে তাঁর নিজের পূর্ণ প্রকাশে সহযোগিতা করেন। পূর্ণতার প্রকাশের পথের অন্তরায়গুলি দূর করিতে পথ প্রদর্শন করেন। শি(ক তার ভিতরের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি(কে জাগরিত করে দেবেন। ফলতঃ শি(ার্থীর ভিতরেই সৃষ্টি হবে প্রতিত্রি(য়া। এই প্রতিত্রি(য়া থেকে নতুন জ্ঞান বা শি(া উৎপন্ন হইবে। ভিতরের ইন্দ্রিয়গন যে শি(া বা অনুভূতি মনের নিকট এবং মন বুদ্ধির নিকট উপস্থিত করিবে, তাহাই নতুন প্রতিত্রি(য়া গড়ে তুলবে।

জগতে সকলেই সর্বদা শি(া দিচ্ছে ' সৎ হও, ভালো হও' কিন্তু সৎ ও ভাল হওয়ার পথ শি(া। আর শি(া বা জ্ঞানলাভের অপর উপাদান একাগ্রতা। বিজ্ঞান যাকে পর্যবে(ন বলিয়া থাকে। শি(া গ্রহনে একাগ্রতা যত বেশী হইবে। ততই শি(ার্থীর জ্ঞানের গভীরতা বাড়বে। স্বামীজীর দাবি মনের একাগ্রতার দ্বারা জগতের সকল সত্য উপলব্দ হয়। একাগ্রতাই একদা গ্রীক সভ্যতাকে জগতের শ্রেষ্ট সভ্যতার উন্নিত করে। শি(া তাই জ্ঞানের গভীরতার সাথে মনের বিকাশ এবং মনকে সংযত করতে শেখায়।

গান্ধীজী তাই বলেছেন শি(ালাভের পথে অসংযত মন প্রধান অন্তরায়। মন একাগ্র এবং সংযত থাকলে শি(ার বিকাশ ঘটে। কিন্তু মন অসংযত, চঞ্চল হলে শি(া বিপরীত পথে চালিত হয়। মন যদি একাগ্র থাকে নিজের অজ্ঞাত সারেই শি(া লাভে অধিক সময় অতিবাহিত হইবে, তুমি যতই শি(া লাভে একাগ্র হবে, ততই জ্ঞানচর্চায় অধিকতর সময় অতিবাহিত হইবে। যখন শি(ার্থীর একাগ্র মন একনিষ্টভাবে বিদ্যাচর্চায় রত হবে, তখন সে নিজ শক্তি(বলে নিজেকে প্রকাশ করিতে শিখিবে। নিজ আদর্শকেই জীবনে

পরিণত করতে চেষ্টা করবে, অপরের যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ করিতে শিখিবে। নিজ অপে(া হীন ব্যক্তি(র থেকেও শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অনুসন্ধান করিবে। অপরের থেকে শি(া গ্রহন করে নিজ আদর্শের সহিত পালন করিবে। ঠিক যেমন বীজ মাটিতে পড়িয়া মৃত্তিকা, বায়ু, জল গ্রহন করে নিজেকে প্রকাশ করে এবং একটি স্বতন্ত্র বৃ(পরিণত হয়। মৃত্তিকা, জল বা বায়ুর আকার নেয় না। আর যেকোন ভাবে শিখিতে চায় না, সে তো পূর্বেই মড়িয়াছে - তার বৃ(হওয়া আর হয় না।

স্বামীজী বলিয়াছেন, মানুষের প্রধান ল(্য হওয়া উচিত সুখ নয়, জ্ঞান লাভ। কিন্তু সুখ ও দুঃখ উভয়ই তার মহান শি(ক, মানুষ শুভ হইতে এবং অশুভ হইতেও শি(া পায়। এই সামগ্রিক শি(াই আমাদের চরিত্র গঠন করে। তিনি বলেছেন, তুমি দরিদ্র বলে নিজেকে হীন ভেবো না। ধনৈশ্বর্য অপে(া দারিদ্র অধিক শি(া দেয়। আমরা দুর্বল বলিয়া ভ্রমে পড়ি, আর অজ্ঞান বলিয়াই দুর্বল। আর নিজেরাই আমরা নিজেদের ভ্রমে বা অজ্ঞানের পথে চালিত করি। কিন্তু ভ্রমের পথে চলেছি বলে ত্র(ন্দন করে দিন কাটিও না। সুযোগ পাওয়া মাত্র জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত কর। এক লহমায় সমস্ত অশুভ চলিয়া যাইবে। মনে রাখিবে শি(াই সংস্কারে পরিণত হইয়া ধমনীগত হইলেই তবে তাহাকে শি(া বলে। যাহা জীবনের সঙ্গে মিশিয়া যায়। তাহাই প্রকৃত শি(া। ভারতভূমির বিকাশের জন্য। যাহাতে মানুষ গঠিত হয়, এমন সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ শি(ার প্রয়োজন।

তাঁহার মতে শি(া বলিতে যদি কতকগুলি বিষয় জ্ঞান বোঝাত, তাহলে লাইব্রেরীগুলিই তো জগরে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং অভিধান সমূহই তো ঋষি রূপে বিবেচিত হত। যে শি(া আমাদের জীবন সংগ্রামী, চরিত্র বলধারী, সাহসী এবং পরহিতকারী করে তোলে, তাহাই প্রকৃত শি(া, কোন শি(া যদি তোমার শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক চেতনায় দুর্বলতা আনে, তা হলে তৎ(নাৎ সেই শি(া পরিহার কর। শি(ার্থীর মধ্যে সর্বদা পবিত্রতা, জ্ঞান পিপাসা ও অধ্যাবসায় থাকা আবশ্যক। মুক্ত(মনে সর্বদা জ্ঞান সন্ধান করিতে হইবে।

স্বামীজী বলিয়াছেন দেশের শি(া পূর্ণতা পাবে তখন, যখন পরম ত্যাগ ও সেবা ব্রতে জীবন অতিবাহিতকারী ভারতীয় নারীদের পূর্ণ শি(া প্রদান করা হইবে। শুধুমাত্র বইয়ের শি(া নয়, যাতে চরিত্র গঠিত হয়। মনের শক্তি(বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের ভালো-মন্দ নির্বাচন করতে পারে। শি(া বিস্তারের জন্য স্ত্রী বিদ্যালয় গঠন ও স্ত্রী শি(কের বড় প্রয়োজন। ভারতবর্ষের শি(া পূর্ণতা পাবে স্ত্রী জাতির শি(ার অগ্রগতির মধ্য দিয়ে। যথার্থ শি(িত পরিবার, যথার্থ শি(িত সমাজ, যথার্থ শি(িত পুত্র-কন্যা-পিতা পাওয়া তখনই সম্ভব। যখন মাতা যথার্থ শি(িত হবেন।

শি(ক ও শি(ার্থী সম্পর্ক সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন, যে ব্যক্তি(র আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি(সঞ্চারিত হয় তাহাকে গু(বা শি(ক এবং যে শক্তি(লাভ করে সে শিষ্য বা শি(ার্থী। গু(র প্রদানের শক্তি(এবং শিষ্যের গ্রহনের শক্তি(থাকা আবশ্যক। শি(ক তাহার শি(ার্থীকে তাহার সঠিক চলার পথের সন্ধান দেবেন। মানুষ মাত্রই চিন্তা-চেতনায় পৃথক। তাই শি(ার্থীকে মৌলিক চিন্তার অধিকারী হওয়ায় সুযোগ দিতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ অপর একটি জ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব। জ্ঞানলাভের প্রয়োজনে তাই উত্তম গু(র শি(া আবশ্যক। প্রকৃত শি(া তিনিই দিতে পারেন। যার দিবার (মতা আছে। আবার শি(ার্থীর ও গ্রহন করার উপযুক্ত(মন ও ইচ্ছাশক্তি(থাকা আবশ্যক। প্রকৃত গু(সহানুভূতের সহিত শিষ্যের অবস্থান বিচার করে নিজেকে রূপায়িত করেন এবং নিজ শক্তি(, শি(া, মন, চিন্তা ও চেতনা শিষ্যের মধ্যে প্রবাহিত করেন।। শি(ার্থীকে বোকা-গাধা বললে তার কোন উন্নতি হয় না বরং উৎসাহ দিলে সময়ে তার অবস্থার অনেক

উন্নতি ঘটে। মানুষের প্রত্যেকেরই ভাব ভিন্ন। সে কখনও তার নিজের ভাবকে অতিত্র(ম করতে পারে না। তাই শি(ার্থীর প্রয়োজনানুযায়ী যে, যেখানে আছে, তাকে সেখান থেকে ঠেলে এগিয়ে দাও।

শি(ার্থীকে মনে রাখতে হবে যে, নিজেকে বি(োস করে না। সেই প্রকৃত নাস্তিক। তাই নিজের প্রতি বি(োস রাখ, ত্যাগ, নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং শুভবুদ্ধি যোগে সকল বিষয়ে ঠিক ঠিক জানবার জন্য কঠিন ব্রত গ্রহন কর।

ঋণ-স্বীকার ঃ -

১) শি(া প্রসঙ্গ বিবেকান্দ, উদ্বোদন কার্যালয়, ২০২২।

২) বি(পথিক বিবেকানন্দ, স্বামী পূর্নাত্মানন্দ উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৮।

৩) স্বামী বিবেকানন্দ, মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, ২০২১

সুব্রত বি(োস,
সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান,
ইতিহাস বিভাগ, কালিনগর মহাবিদ্যালয়

জল সংর(নের ইতিহাস

— হারান গায়েন (Hons., 2nd Sem)

জল সংর(ন বলতে বারিমন্ডল র(া। বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মানুষের চাহিদা মেটাতে পরিবেশ বান্ধব প্রাকৃতিক সম্পদ বিশুদ্ধ জলের পরিমাণ বজায় সর্ব নীতি, কৌশল এবং কার্যত্র(মকে বোঝায়। জনসংখ্যা, পরিবারের আকার, বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি সব প্রভাবিত হয় কতটা জল ব্যবহার করা হয় তার উপর। পৃথিবীর সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং পৃথিবীর সকল প্রজাতি জলের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। পৃথিবীর মোট জলের মাত্র ৩ শতাংশ পান যোগ্য। ১.৬ শতাংশ জল বরফ ও হিমবাহের আকারে রয়েছে। ০.৩৬ শতাংশ জল মাটির নীচে রয়েছে। তবে বর্তমানে যে হারে জল অপচয় হচ্ছে তাতে নিশ্চিত যে, আর কয়েক বছর পর বিপুল পরিমাণে পানিয় জলের সংকট দেখা দেবে। তাই সকলকে ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে তাকিয়ে সচেতন হয়ে জল ব্যবহার ও অপচয় করতে হবে।

আমাদের মহাকাশের গ্রহগুলির মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতে জীব ও উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়েছে কারণ মহাকাশের ৮টি গ্রহের মধ্যে শুধুমাত্র পৃথিবীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল রয়েছে। এই কারণে ‘নীল গ্রহ’ বলা হয়। জল ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রায় ৭১ শতাংশ জল। কিন্তু পৃথিবী পৃষ্ঠে বিশুদ্ধ পানীয় জলের পরিমাণ খুবই সামান্য। তাই জল সংর(ণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আধুনিক জীবন চলছে দ্রুতগতিতে ত্র(মবর্ধমান নগরায়ন ও বি(োয়নের চাকায় ভর করে। যে জলের দ্বারা সভ্যতার উদগমন হয়েছিল, সেই জলকে কেন্দ্র করে জীবন ও জীবিকার বর্ধন সম্ভব হয়েছিল, সেই জলের অভাব আগামী প্রজন্ম-কে ভাবাচ্ছে। এই কারণে ইতিপূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মানুষের চাহিদা মেটাতে পরিবেশ বান্ধব প্রাকৃতিক সম্পদ বিশুদ্ধ জলের পরিমাণ বজায় রাখতে জলসংর(নের বিভিন্ন নীতি ও কৌশল গ্রহন করেছে। জল সংর(নের মূল উদ্দেশ্য হল - ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য বিশুদ্ধ জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। জলকে শক্তি(রূপে গন্য করে

তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন।

মানুষের সচেতনতা ও সাবধনতাই জলসংর(ন সম্ভবনার প্রধান উপায়। প্রাকৃতিক শক্তি(র ব্যবহার এবং ব্যবহৃত শক্তি(র পুনর্নবীকরণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জলসংর(নের যেসব উপায় রয়েছে তার যথাযথ সুষ্ঠু ও আশু ব্যবহার এই মুহূর্তে একান্ত জ(রী। আমরা যদি উপলব্ধি করি তাহলে তেল ও জল দুই-ই সমান মহার্ঘ, তাহলে তেল সংর(ণের মতো জলসংর(ন করার কথা ভাবতে পারি। আর সেই ভাবনা ও ভাবনার যথার্থ রূপায়নই পারে এই সমস্যার সমাধান করতে।

বালাজী বি(্বনাথ (১৭১৩-২০ খ্রীঃ)

— শ্রাবনী সরকার (4th Sem)

শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠা জাতি যখন চরম আত্মকলহে নিমগ্ন, সেই সময় বালাজী বি(্বনাথ নামে এক মারাঠা রাষ্ট্রনেতার আর্বিভাব ঘটে। বংশানুত্র(মিক পেশোয়াতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বালাজী বি(্বনাথ। কোঙ্কনের এক দরিদ্র ব্রাহ্মনের ঘরে তাঁর জন্ম হয়। ১৭০৮ খ্রীঃ ছত্রপতি শাহুর অন্যতম সেনাপতি ধনাজী যাদবের অধীনে একজন 'কারকুন' (রাজস্ব কর্মচারী) হিসাবে তিনি সরকারি কাজে যোগ দেন। আপন যোগ্যতাবলে তিনি দ্রুত উন্নতিলাভ করেন। মারাঠাদের গৃহবিবাদের সময় তিনি শাহুর প(অবলম্বন করেন এবং রাজনৈতিক তী(্ণ বুদ্ধির প্রয়োগ করে অধিকাংশ মারাঠা সর্দারকে শাহুর প(ে আনতে স(ম হন। তাঁর কর্মদ(তায় আকৃষ্ট হয়ে শাহু তাঁকে 'পেশোয়া' বা প্রধানমন্ত্রী পদে উন্নিত করেন (১৭১২ খ্রীঃ)।

বালাজীর পেশোয়া পদ গ্রহনের সময় মারাঠা রাজ্য নানা সমস্যায় বিব্রত ছিল। এই সমস্যাগুলি যেমন ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি জটিল।

প্রথমত ঃ শাহু ছত্রপতি হলেও তার সিংহাসন নিরঙ্কুশ ছিল না। কোলাপুর গোষ্ঠী (তারাবাঈ প্রমুখ) (মতা পূর্নদখলের ষড়যন্ত্রে তখন ও লিপ্ত ছিল। মারাঠা সর্দারেরা ছিলেন স্বাধীনচেতা। এইসব সর্দারকে বশীভূত করে শাহুর (মতা দখলের সম্ভবনা বিনষ্ট করা ছিল বালাজী বি(্বনাথের প্রথম ও প্রধান কাজ।

দ্বিতীয়ত ঃ- মুঘল রাজবংশের পতনোন্মুখ অবস্থা এবং মারাঠা জাতির মুঘল বিরোধী মানসিকতা সম্পর্কে বালাজী সচেতন ছিলেন। মুঘলদের গৃহবিবাদ ও দলাদলির সুযোগে শিবাজীর আদর্শ ও ল(্য পূরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া যে সম্ভব। এ তথ্য তাঁর আজানা ছিল না।

বালাজী বি(্বনাথ সমগ্র মহারাষ্ট্রে এক অভিনব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে সব মারাঠা দলপতি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ও পরস্পরের প(ে অপরিহার্য হয়ে ওঠেন। মারাঠা রাজ্যের বিভিন্ন রাজকর্মচারী 'প্রতিনিধি' সেনাপতি প্রভৃতি নির্দিষ্ট নিয়মে 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' কর আদায় করতেন। উপরন্তু শিবাজীর সময়ে যে জায়গীর প্রথা রহিত হয়েছিল রাজারামের সময় মত পুনঃপ্রবর্তিত হয়। বালাজী বি(্বনাথের আমলে মারাঠা জায়গীরদাররা সময় তা পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

পরিশেষে জানা যায় যে, বালাজী বি(্বনাথ (ভাট) (১৬৬২-১৭২০) পেশওয়া বালাজী বি(্বনাথ নামে অধিক পরিচিত। মারাঠা সাম্রাজ্যের একজন শক্তি(শালী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠা সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার করেন।

তথ্যসূত্র ঃ- ১) মধ্যযুগের ভারত মুঘল আমল (১৫২৬-১৮১৮) - তেসলিম চৌধুরি,

২) ভারতের ইতিহাস - জীবন মুখোপাধ্যায়

স্বদেশি ও বয়কট (১৯০৫-১১)

— রূমা দাস (Hons., 6th Sem)

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তা বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলন নামে খ্যাতি লাভ করে। এই আন্দোলনের মূল চরিত্রের একটি স্বদেশী ও বয়কট।

'স্বদেশী' ও বয়কট ছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান অস্ত্র ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় ''বয়কট ও স্বদেশী' একে অন্যের পরিপূরক। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে লর্ড কার্জন সিমলায় বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে বাংলায় প্রতিত্রি(য়ার সৃষ্টি হয় কার্জন তাঁর সিমলা ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিলেন ''আমি এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটাবই। বাংলার মানুষের সমস্ত প্রতিবাদ ধিক্কারকে অগ্রাহ্য করে লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ব্যাপারে অনড় থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাব অনুসারে ওইদিন সাম্প্রদায়িক সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক স্বরূপ 'রাখিবন্ধন উৎসব' পালন করা হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পরামর্শে বাংলার ঐক্যের নিদর্শন স্বরূপ ঘরে ঘরে অরন্ধন পালিত হয়।

স্বদেশী আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

— রীনা মন্ডল (Hons., 6th Sem)

'' এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরেজ,
এসো এসো খ্রিষ্টান।''

ভারতের ইংরেজ শাসনকে শক্ত(করতে ব্রিটিশরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ঘটিয়ে বাঙালি জাতিকে হীনবল ও পঙ্গু করার চেষ্টা চালায়। এই উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিঃ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রাণকেন্দ্র বাংলা প্রেসিডেন্সিকে দু-টুকরো করার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ হিসাবে শাসনতান্ত্রিক সুবিধার কথা বলা হলেও প্রকৃত উদ্দেশ্য যে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু সহজেই ধরা পড়ে যায়, তাই জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ যেকোন মূল্যে এই বঙ্গভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্ত নেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অঙ্গরূপে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন শু(হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেচ্ছায় এগিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজ শাসকের উদ্দেশ্যে বলেন - ''দন্ড প্রয়োগের অধিকৃত রূপকে আমি বর্বরতা বলি।''

১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর ছিল বঙ্গভঙ্গের কার্যকারী হওয়ার দিন, রবীন্দ্রনাথের পূর্বপরিকল্পীত 'রাখি বন্ধন' ছিল একটি প্রধান অঙ্গ। ১৯১৯ খ্রীঃ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে তিনি 'নাইট হুড' উপাধি বর্জন করেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনকে আরও গতিশীল ও উজ্জিবিত করার ল(্য স্বদেশী

যুগ (১৯০৫-১২) মোট ২৭টি দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন। এই সমস্ত দেশাত্মবোধক গান আজও মানুষকে স্বদেশ প্রেমে উদ্দীপিত করে। এসব গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গান হল —

"বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক
হে ভগবান"

ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজির উত্থান (১৯১৫-২০)

— অয়নী মন্ডল (Hons., 6th Sem)

ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর উত্থান আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্য পূর্ণ ঘটনা। বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী যে আন্দোলন শু(হয় সেই আন্দোলনের তিনি নেতৃত্ব দেন। তার নেতৃত্ব গ্রহণের ফলে জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে শু(হয় এক নতুন অধ্যায়।

প্রথম জীবনে গান্ধীজি ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন না। ১৯০৬ সালে দ(ণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার এশিয়াটিক সংশোধনী আইন প্রবর্তন করলে গান্ধীজি ভারতীয়দের সঙ্গবদ্ধ করে এক প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলন সত্যাগ্রহ আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯১৪ সালে দ(ণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকার ভারতীয়দের উপর থেকে অবমাননাকর আইন প্রত্যাহার করে নেন। এই আন্দোলনের ফলে গান্ধীজি সর্বপ্রথম রাজনৈতিক নেতা হিসাবে পরিচিত হন। দ(ণ আফ্রিকায় পরিচালিত গান্ধীজির বর্ণ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন ছিল তার জীবনের দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯১৫ সালে গান্ধিজী ভারতে আসেন। সেই সময় তিনি সকল ভারতীয়দের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন তার দ(ণ আফ্রিকায় সফলতার জন্য। তার রাজনৈতিক গু(গোপাল কৃষ(গোখলের নির্দেশে তিনি কিছুদিন ভারত ভ্রমণ করেন এবং ভারতীয় জীবন ধারার প্রণালি ও রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে যোগদানের পূর্বে ১৯১৭ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত গান্ধীজি তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ সংগ্রামে অবতীর্ন হয়েছিলেন। একটি বিহারের চম্পারনে এবং অপর দুটি গুজরাটের আমেদাবাদ ও খেদায়।

চম্পারন ছিল বিহারের অন্তর্গত একটি জেলা। এই সময়ে গান্ধীজি চম্পারন কৃষকদের দুর্দশার কথা জানতে পারে, যেখানে কৃষকরা তিন কাটিয়া ব্যবস্থার স্বীকার ছিল। এমন ব্যবস্থা ছিল যে কুড়ি কাঠা জমি থাকলে তাকে ৩ কাঠা জমিতে বাধ্যতামূলক ভাবে নীলচাষ করতে হবে। নীল চাষে কৃষকদের মুনাফা না হওয়াই তাদের অবস্থা ক(ন হয়ে পড়েছিল। এই সময় গান্ধীজি ভারতে এসে চম্পারন সত্যাগ্রহ শু(করেন ১৯১৭ সালে। তার এই সত্যাগ্রহ সফল হয় এবং সরকার ঘোষণা করেন যে সমস্ত কৃষক অর্থ দিতে অসমর্থ তাদের থেকে টাকা নেওয়া হবে না কেবলমাত্র সেই সমস্ত কৃষকদের থেকে টাকা নেওয়া হবে যাদের সেই টাকা দেওয়ার (মতা আছে।

এই সময় আমেদাবাদের বস্ত্রকল শ্রমিকরা বেতন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করেছিল। গান্ধীজি শ্রমিকদের নির্দেশ দেন। তার নির্দেশে শ্রমিকগণ শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্দোলন করেন। শ্রমিকদের দাবীর

সমর্থনে গান্ধীজি অনশন শু(করেন। ২১ দিনের ধর্মঘটের পর মিলের মালিক ৩৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি করে। মালিক, শ্রমিক শ্রেণির মাধ্যমে শিল্প বিরোধে সমাধান করা সম্ভব তা গান্ধীজি প্রমাণ করেন।

আমেদাবাদের শ্রমিক ধর্মঘটের পরেই গান্ধীজি গুজরাটের খেদা জেলায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন শু(করেন। গুজরাটের এই জায়গা যেখানে ১৯১৪ সালে খরার কারণে ফসল না পাওয়ায় কৃষকরা কর দিতে পারছিল না। কিন্তু সরকার তাদের কর মাফ করছিলো না। গান্ধীজি এই অন্যায় দেখে সেখানে সত্যাগ্রহ শু(করেন এবং এই সত্যাগ্রহ সফল হয় এবং এই কৃষকদের খাজনা মাফ করে দেওয়া হয়।

হোম(ল আন্দোলন (১৯১৬)

— সাগরিকা মন্ডল (4th Sem)

যদিও ভারতে হোম(ল আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন অ্যানি বেসান্ত, তা স্বত্ত্বেও দুটি হোম(ল লিগ তৈরি হয়েছিল। একটি লিগ মাদ্রাজে তৈরি করেন অ্যানি বেসান্ত ১৯১৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে, অন্যটি ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে তিলকের উদ্যোগে বেলগাঁও ও পুনাতে তৈরি হয়েছিল। তিলকের লিগ মূলত মহারাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ১৯১৭ সালে এর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪ হাজার। অ্যানি বেসান্ত এর হোম(ল লিগের প্রভাব ছিল আরও সুদূর বিস্তৃত এবং এর সদস্য সংখ্যা ছিল মোটামুটি ২৭ হাজার।

হোম(ল লিগগুলির কার্যাবলী মূলত আলাপ আলোচনা, পত্রিকা বিত্রি(এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃ(তা দেওয়া ইত্যাদির মধ্যেই সীমিত ছিল। বিপান চন্দ্র বলেছেন — হোম(ল লিগ দুটো পারস্পরিক সংঘাত এড়ানোর জন্য তাদের কর্মকান্ডের এলাকা ভাগ করে নিয়েছিল। তিলকের কার্যাবলীর এলাকা ছিল মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার। ভারতের অবশিষ্ট অংশে সত্রি(য় ছিল অ্যানি বেসান্তের হোম(ল লিগ। ডেভিড ওয়াশব্রুক তাঁর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি সংক্র(ান্ত গবেষনায় দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ সরকার হোম(ল লিগের কার্যাবলীতে যথেষ্ট আশঙ্কিত হয়েছিল। বৃহৎ ভূস্বামী শ্রেণী ও অর্থলগ্নীকারীদের একটা বড়ো অংশ হোম(ল আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বক্তব্য গ্রহনযোগ্য নয়। হোম(লেরা মোটেই ব্রিটিশ শাসকদের প(্যে বিপজ্জনক ছিলেন না। ১৯১৬ সালের ১ মে তিলক হোম(ল লীগের সভায় বক্তৃ(তা দিতে বলেছিলেন। আমরা বর্তমান শাসন পরিচালনার (ে ত্রে কিছু পরিবর্তন দাবী করছি এবং সেই পরিবর্তনগুলি সাধিত হলে ব্রিটিশ সরকারেরর অস্তিত্ব মোটেই বিপন্ন হবে না।

অনেক নরমপন্থী কংগ্রেস নেতাই হোম(ল আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। হোম(ল লীগে নরমপন্তীদের যোগদান মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। কারণ নরমপন্থীরা এতদিন ধরে যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন হোম(লেরা তা বাস্তবায়িত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। নরমপন্থী নেতা ফিরোজ শাহ মেহতা চরমপন্থীদের সহ্য করতে পারতেন না। ১৯১৫ সালে তার মৃত্যু নরমপন্থী চরমপন্থী মিলনের পথ প্রশস্ত করেছিল। ১৯১৬ সালে কংগ্রেসের লক্নৌ অধিবেশনে অ্যানি বেসান্তের উদ্যোগে নরমপন্থী চরমপন্থী ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম বি(্বযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় তিলকের নেতৃত্বাধীন হোম(ল লীগ দাবী করেছিল যে, ভারতীয়রা ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধে তখনই সাহায্য করবে যদি তারা সরকারের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি পায় যে যুদ্ধ জয়ের পর সরকার তাদের প্রধান রাজনৈতিক দাবী অর্থাৎ হোম(লের দাবী মেনে নেবে। তিলকের

আন্দোলনের সমর্থনের ভিত্তি ছিল অব্রাহ্মন বনিক গোষ্ঠী, গুর্জ্জর, মারাঠা ও চিৎপাবন ব্রাহ্মনরা। অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বাধীন হোম(লে লীগের সভাপতি সুব্রহ্মনম আয়ার মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসনকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, তাদের হোম(লে সংত্র(ান্ত দাবী মেনে নেওয়া হলে তারা আগামী দুমাসে ১০ মিলিয়ন ভারতীয়কে মিত্রপ(র হয়ে যুদ্ধে পাঠাতে পারে। অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বাধীন লীগের সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন তামিল ব্রাহ্মনরা, যুক্ত(প্রদেশের শহার, বৃত্তিজীবী মানুষ, বম্বে ও গুজরাটের ব্যবসায়ী ও আইনজীবীরা।

১৯১৭ সালের মধ্যে হোম(লে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। তিলক ভ্যালেন্টাইন চিরলের বি(দ্ধে মামলা লড়ার জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়ার বিষয়টি বেশি জ(রী বলে মনে করেছিলেন। অ্যানি বেসান্ত ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেল থেকে ছাড়া পাবার পরই ভারতসচিব মন্টেগুর ২০ আগস্টের প্রতিশ্রুতিকে অধিকতর গ্রহনযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। মন্টেগু মন্তব্য করেছিলেন ব্রিটিশ সরকারের মূল নীতি হল শাসনতন্ত্রের প্রতিটি শাখায় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ ঘটানে

রাওলাট সত্যাগ্রহ (১৯১৯)

— অ(প ঘোষ (Hons., 6th Sem)

চম্পারন, খেদা বা আমেদাবাদ প্রভৃতি সত্যাগ্রহ আন্দোলনগুলি ছিল গান্ধীজি পরিচালিত আঞ্চলিক আন্দোলন, যা কেবলমাত্র সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যেই আবদ্দ ছিল। কুখ্যাত রাওলাট আইন পাসের পর ব্রিটিশ বিরোধীগণ আন্দোলনগুলি সর্বজনীন রূপ ধারণ করে এবং অধিকাংশ ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের এহেন পৈশাচিক আইনের বি(দ্ধে তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯১৯ খ্রিঃ রাওলাট আইনের বি(দ্ধে পরিচালিত রাওলাট সত্যাগ্রহ আন্দোলনটি গান্ধীজিকে সর্বভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে প্রথম নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

গান্ধীজি স্বৈরাচারী রাওলাট আইনের বি(দ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ সত্যাগ্রহ - এর পথ বেছে নিয়েছিল। সত্যের ভিত্তিতে নৈতিক শক্তি(র সাহায্যে অহিংস উপায়ে প্রতিপ(র হৃদয় জয় করাই হল সত্যাগ্রহ। ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক আইনের বি(দ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে গান্ধীজির নেতৃত্বে যে দীর্ঘস্থায়ী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শু(হয়, তা ইতিহাসে রাওলাট সত্যাগ্রহ নামে পরিচিত।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০-এ মার্চ গান্ধীজি যে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন সেটাই ভারতবর্ষের প্রথম সর্বভারতীয় ধর্মঘট। গান্ধীজি অবশ্য ধর্মঘটের তারিখ পরিবর্তন করে তা ৬ এপ্রিল ধার্য করেন। কিন্তু সংবাদ ঠিক সময়মতো না পৌঁছানোর ফলে দিল্লি, মুলতান, লাহোর, অমৃতসর সেই ধর্মঘট পালিত হয়। দুর্বল প্রতিবাদ বা নিছক নিন্দা প্রকাশ নয়। গান্ধীজির নেতৃত্বে পরিচালিত রাওলাট সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ সরকারের বি(দ্ধে ভারতব্যাপী এক হরতাল। এই ধর্মঘটের সফলতা অর্জনের ল(্যে দিল্লিতে আজমল খাঁ এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গান্ধীজির প্রধান সমর্থকে পরিণত হয়েছিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্যের নজির পাওয়া যায়। হিন্দু নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে জামা মসজিদের বেদি থেকে উদাত্ত কণ্ঠে ভাষণ দিতে শোনা যায়। দিল্লিতে পুলিশের গুলিতে সাধারণ জনতার মৃত্যুর খবর শুনে গান্ধীজি ৭ এপ্রিল দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ১০ এপ্রিল দিল্লির নিকট পালওয়াল স্টেশন থেকে গ্রেফতার

হন। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর দিল্লি যাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। গান্ধীজির গ্রেফতারের সংবাদ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পুলিশ জনতা সংঘর্ষ শু(হয়।

রাওলাট সত্যাগ্রহ ছিল প্রথম সর্বভারতীয় ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলন, যেখানে প্রথম জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মানুষ স্বত্বস্ফুর্তভাবে যোগদান করেছিল এবং যা গান্ধীজিকে প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল।

ভারতীয় রাজনীতির ওপর প্রথম বি(্বযুদ্ধের প্রভাব (১৯১৪-১৮)

— দূবা গাইন (Hons., 6th Semi)

১৯১৪-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম বি(্বযুদ্ধ চলেছিল। এই সময়কাল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক যুগ সন্ধি(ন, নানা নাটকীয় ঘটনা পরিপূর্ণ। এই সময়কার তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন, গান্ধীজির নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী গণ আন্দোলনের বিকাশ এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে পরিবর্তন। প্রথম মহাযুদ্ধ নানা কারণে স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার করেছিল। যুদ্ধের চাপে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক মহল ও ভারতের ব্রিটিশ রাজপু(যরা ভারতীয়দের আশা আকাঙ্খা পূরণে খানিকটা নমনীয় মনোভাব দেখিয়েছিল।

প্রথম বি(্বযুদ্ধের শু(তে ভারতের রাজনীতি ছিল অশান্ত ও অস্থির, নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে আপস হয়নি। নরমপন্থী বা চরমপন্থী কোনো মতামত জনগনের আস্থা অর্জন করতে পারেনি এবং জাতীয় রাজনীতি ব্যক্তি(গত হয়ে উঠেছিল। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে বাল গঙ্গাধর তিলক মান্দালয় জেল থেকে ফিরে এসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। ভারতীয় রাজনীতির এরকম এক সংকটজনক মুহূর্তে গান্ধীজির আর্বিভাব ঘটে। ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি একেবারে অপরিচিত ছিল না। ১৯১৫ সালে ভারতে ফিরে এসে গুজরাটে আশ্রম স্থাপন করেন। ভারতের যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা গণ আন্দোলনের উপযুক্ত(পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

ভারত প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দেওয়া ও সমরখাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩০০ শতাংশ। যুদ্ধের জন্য ভারতে ব্যয় হয়েছিল ১২৭ পাউন্ড এবং ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩০ ভাগ। ভারত সরকার জবরদস্তি ঋণ ও কর সংগ্রহ করেছিল। যুদ্ধ ব্যয়, আমদানি হ্রাস, উৎপাদন হ্রাস ও দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি জীবন যাত্রার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। দরিদ্র মানুষের মোটা খাদ্য শস্যের দাম তুলনামূলক ভাবে বেড়ে যায়। ভারতের বনিক এবং শিল্পপতিরা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে লাভবান হয়েছিল এর কারণ হল বিদেশ থেকে আমদানি হ্রাস এবং নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়।

যুদ্ধের সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে অনটন, অনশনের ঘটনা ঘটলে দাঙ্গা ও লুটপাঠের ঘটনা ঘটেছিল। বাংলা বাজারেও লুঠের ঘটনা ঘটেছিল। ভারত সরকারের যুদ্ধ ব্যয় সৈন্য সংগ্রহ ও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি গান্ধীজির গণ আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করে দিয়েছিল।

সর্বোপরি প্রথম বি(্বযুদ্ধের পরেই মিশর- আয়ারল্যান্ড ইত্যাদি দেশের ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে। অতঃপর জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ যৌথ কর্মসূচী রূপায়নের ইচ্ছা প্রকাশ করে, যা ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন গতি প্রদান করে।

গান্ধীজি ও ডান্ডি অভিযান

— সুদীপ্তা বর্মন (Hons., 6th Sem)

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে অন্যতম আন্দোলন হল মহাত্মা গান্ধীজির নেতৃত্বে হওয়া ডান্ডি অভিযান বা লবন সত্যাগ্রহ। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তরফে 'পূর্ণ স্বরাজ' প্রস্তাব গ্রহন করার কিছুদিন পরই ১৯৩০ সালের ১২ ই মার্চ শু(হয় ডান্ডি অভিযান। লবন পদযাত্রা ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশদের একচেটিয়া লবন নীতির বি(দ্ধে একটি অহিংস কর প্রদান বিরোধী প্রতিবাদ আন্দোলন। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা হয়।

১৯২৯ সালের দেশ জুড়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে মহাত্মা গান্ধী সরকারের নিকট ১১ দফা দাবী সহ এক চরমপত্র পাঠান। আরউইন এই দাবী নাকচ করলে গান্ধীজি আমেদাবাদের সবরমতী আশ্রম থেকে ডান্ডি অভিযান শু(করে ২৪ দিনে ২৪০ মাইল পথ হেঁটে ডান্ডি গ্রামে পৌছান অনুগামীদের নিয়ে। ১৯৩০ সালের ৬ ই এপ্রিল তিনি গুজরাতের ডান্ডিতে সমুদ্রের জল থেকে লবন তৈরির মাধ্যমে লবন আইন ভঙ্গ করে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন।

গান্ধীজির ডান্ডি অভিযান শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র বি(েব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বি(েবাসীকে অনুপ্রানিত করেছিল। ইংরেজ সরকার নিরীহ, নিরপরাধ সত্যাগ্রহীদের উপর নির্মম অত্যাচার করেছিল তাতে বি(ে জনমত ভারতের অনুকূলে গিয়েছিল। তিনি লবন সত্যাগ্রহের মাধ্যমে দেশের বৃহত্তর সংখ্যক নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়কে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল করতে চেয়েছিলেন।

বিস্ময় বিপ্লবী (দিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮)

— ক(নাময়ী সরদার (Hons., 4th Sem)

'চিনতে নাকি সোনার ছেলে
(দিরামকে চিনতে ?
(দ্ধ(োসে প্রাণ দিল যে
মুক্ত(বাতাস কিনতে'

কবি আল মাহমুদের মুক্ত(বাতাস কিনতে প্রাণ দেওয়া সোনার ছেলের নাম (দিরাম বসু। প্রায় দুইশো বছর ব্রিটিশ শাসকদের হাত থেকে মুক্তি(পেতে আন্দোলন সংগ্রামে যার ভূমিকা ছিল অগ্রগামী। যারা অস্ত্র হাতে অত্যাচারী ব্রিটিশদের বি(দ্ধে (খে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিয়েছিল, সেই তালিকার শু(র দিকে রয়েছে (দিরাম বসুর নাম। ১৮৮৯ সালের ৩ ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার হাবিবপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা ত্রৈলক্যনাথ বসু এবং মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। ১৯০৩ সালে মেদিনীপুরের 'কলেজিয়েট' স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তিনি লেখাপড়া করেন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলন (দিরামের মতো স্কুলের ছাত্রদেরও প্রভাবিত করে এবং পরিনামে তিনি পড়াশোনা ছেড়ে সত্যেন্দ্র বসুর নেতৃত্বে এক গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসাবে ইংল্যান্ডে উৎপাদিত কাপড় পোড়ানো ও ইংল্যান্ডের থেকে আমদানিকৃত

লবনে বোঝাই নৌকা ডোবানোর কাজে (দিরাম অংশ নেয়। ১৯০৬ সালের মার্চে মেদিনীপুরের এক কৃষি ও শিল্প মেলায় রাজদ্রোহমূলক ইস্তেহার বন্টনকালে (দিরাম প্রথমে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও পালিয়ে যেতে স(ম হন। ১৯০৭ সালে হাটগাছায় ডাকের থলি লুঠ করা এবং ১৯০৭ সালের ৬ ডিসেম্বরে নারায়নগড় রেল স্টেশনের কাছে বঙ্গের ছোটোলাটের বিশেষ রেলগাড়িতে বোমা আত্র(মনের ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। একই বছরে মেদিনীপুর শহরে অনুষ্ঠিত এক রাজনৈতিক সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- এর মধ্যপন্থী রাজনৈতিক নীতির বি(দ্ধে তিনি বি(োভ করেন।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীদের প্রয়োজন ভিত্তিক কঠোর সাজাও দমন নীতির কারণে কলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড বাঙালিদের অত্যন্ত ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। যুগান্তর বিপ-বীদল ১৯০৮ সালে তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে এবং প্রফুল্ল চাকী ও (দিরামের উপর এ দায়িত্ব পড়ে। কিন্তু কিংসফোর্ড এর গাড়ীর বদলে ভুলবশত অন্য একটি গাড়িতে বোমা মারলে দুজন ইংরেজ মহিলা মারা যান। প্রত্য(দর্শীদের সা(্য অনুযায়ী মুজফফরপুর কারাগারে ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ফাঁসিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

স্বাধীনতার স্বপ্নে তিনি মৃত্যু ভয়কেও বশ করেছিলেন। ফাঁসির মঞ্চে তাঁর শেষ কথা চমকে দিয়েছিল উপস্থিত সকলকে। ১০ আগস্ট আইনজীবি সতীশচন্দ্র চত্র(বর্তীকে (দিরাম বলেছিলেন, 'রাজপুত নারীরা যেমন নির্ভয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়া জওহর ব্রত পালন করিত, আমিও তেমন নির্ভয়ে দেশের জন্য প্রাণ দিব। আগামীকাল আমি ফাঁসির আগে চতুর্ভুজার প্রসাদ খাইয়া বধ্যভূমিতে যাইতে চাই। ফাঁসির আগে উপস্থিত আইনজীবিদের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছিলেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই দেশের জন্য মৃত্যু বরণ করেছিলেন তিনি। আর শিখিয়ে গিয়েছিলেন দেশকে কিভাবে ভালোবাসতে হয়। কিভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হয়। তাঁর জন্মই ছিল বিপ-বের উদাহরন হয়ে বেঁচে থাকতে। অকুতোভয় যুবকটির বৈপ-বিক প্রয়াস আগামী প্রজন্মের যুবকদের কাছে অনুসরনযোগ্য ছিল। পরাধীন ভারতের মুক্তি(মন্ত্রে আত্মহুতির যে নিদর্শন (দিরাম তাঁর সঙ্গী প্রফুল্ল চাকীকে নিয়ে রেখে গিয়েছেন তা সশস্ত্র বিপ-বী আন্দোলনের ভিতকে আরও মজবুত করেছিল তাই আজও স্বাধীনচেতারা তাকে স্মরণ করে বলে 'শুভ জন্মদিন বিপ-বী (দিরাম বসু'।

সুন্দরতম সুন্দরবন

— মৌসুমী রপ্তান (Hons., 2nd Sem)

বাংলাদেশ, একটি ভূখন্ড। যার বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে নদ-নদী। তবে দ(ণাঞ্চলে বিস্তৃত বনাঞ্চল। একে 'ম্যানগ্রোভ বন' বলা হয়। এর কিন্তু চমৎকার একটা নাম আছে। এই বনে থাকা ''সুন্দরী'' গাছের নামেই বনের নামটি সুন্দরবন। যদিও 'সুন্দরীবন' নামটা বেশি যুক্তি(যুক্ত(হতো। এই লেখাটা সাজিয়েছি সুন্দরতম সুন্দরবনকে নিয়েই। সুন্দরবনের গাছে গাছে মৌচাক। মৌমাছির তৈরী খাঁটি মৌচাক। মৌচাকে খাঁটি মধু। বাজারে চিনি মেশানো ভেজাল মধু না। সুন্দরবনের নামকরণে অনেকের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা বর্তমান থাকলেও বহুল প্রচলিত কাহিনী হল সুন্দরবনের নাম সুন্দরী নামক ম্যানগ্রোভের আধিপত্যের কারণে সুন্দরবন নামটাই প্রচার হয়। সুন্দরবন হলো পৃথিবীর সবথেকে বড়ো ম্যানগ্রোভ অরণ্য। সুন্দরবনের মোট আয়তন ১০ হাজার বর্গ কি.মি.। জল-জঙ্গল-জীব সমাহারে 'সুন্দরবন'। নদীমাতৃকতাই সুন্দরবনের মৌল। চব্বিশ পরগনা ৮৮°-৮৯° পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ২১°৩০' - ২৩° ডিগ্রি উত্তর অ(রেখার মধ্যে অবস্থিত ও এর এক তৃতীয়াংশ সুন্দরবন। সমগ্র ভূভাগ ত্র(মেশ ঢালু হয়ে সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে। বঙ্গোপসাগর সন্নিহিত হওয়ায় সুন্দরবনে দ(ণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর পরিমাণ ঝড় বৃষ্টি হয়। নিম্নচাপ এবং জলস্ফীতিও। মাঝে মাঝে 'সুনামির' মতো 'আয়লা' আসে। জনপদভূমি বিধ্বস্ত করে দিয়ে যায়। জলবায়ু উষ(আদ্র ও গুমোট এবং সমুদ্র সান্নিধ্য ও নদীর জোয়ার - ভাটার প্রভাবে বাতাসে নোনা জলীয় বাষ্প থাকে বেশি।

মার্চ থেকে জুন গ্রীষ্মকাল - তাপমাত্রা ৩৬° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর বর্ষাকাল। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমান ৮০"। শীতের তাপমাত্রা ১৪° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। উদ্ভিদ উপযোগী চরভূমি সৃষ্টি ও গঠনের প্রাথমিক পর্যায় পর্যবে(নে সুন্দরবনের আদি আত্মার পরিচয় খানিকটা মিললেও সুন্দরবন ভাঙা গড়ার অমোঘ প্রকৃতির অস্থির অবস্থানের চিরস্মারক। ভাঙতে ভাঙতে গড়ার বন্ধনে সুন্দরবন পৃথিবীর বিস্ময় ও সর্ববৃহৎ বদ্বীপ অঞ্চল। এখানেই অবস্থিত ভুবন বিখ্যাত 'ম্যানগ্রোভ' উদ্ভিদের বনভূমি।